ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)
চতুর্থ খলীফা, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

"সিডনীতে (অস্ট্রেলিয়া) প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন

আমি আজ আলোচনা করবো ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত ইসলামী দর্শনের উপরে। ধর্ম সব সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ঐশী মধ্যস্থতায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লা একজন সংস্কারক প্রেরণ করেন যিনি মানুষকে বস্তুবাদিতা থেকে ফিরায়ে আনেন এবং তাদেরকে তাদের স্রষ্টার দিকে পরিচালিত করেন। এই ধারার সংস্কারকগণ মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র নামে বিপুল ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। তিনি মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করবার আমন্ত্রণ জানান; অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল হতে বলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দান করেন যে, তারা যদি অমর হতে চায় তাহলে তাদেরকে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করেন দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামের জন্যে—তাদেরই অন্ধ বিরোধিতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যাদেরকে তাঁরা ভালবাসেন এবং রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হন। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের একমাত্র প্রকৃত ও চিরন্তন দর্শন। এর বিরোধী বাকী সব দর্শনই উদ্ভট কল্পনা। তথাপি, আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, ইসলামের সবগুলি ফের্কা বা সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত নয়। বিপুল সংখ্যক মুসলমান এই বিশ্বাস পোষণ করে যে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার মধ্যে এক প্রকার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অপরপক্ষে, আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়। মুসলমানদের মধ্যেকার মত-

বৈষম্যের কারণে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি যাতে না হয় সেজন্যে আমি কেবল সেই সকল মৌলিক বিশ্বাস বা আকিদার উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে করছি, যেগুলো সব মুসলমানই মানেন এবং তাদের সবাইকে একত্র রাখে, তা তারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হোন না কেন।

সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াতে। প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে, মানবতার চূড়ান্ত পরিত্রাণের ধর্ম হচ্ছে—ইসলাম। সকল মুসলমান বিশ্বাস করে যে, বিচার দিবস বা কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম মানুষের সকল আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে থাকবে। সকল মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে যে শরীয়ত বা বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় এবং পবিত্র কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিকার্য ও অপরিবর্তনীয়। এমন কি এর প্রতিটি অক্ষর ও প্রতিটি 'যের-যবর' বা আকার-ইকার পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। সকল মতবাদের, সকল চিন্তার মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মানবজাতির শেষ দিনটি পর্যন্ত রসূলে করীম মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুশাসনের বৈধতা অক্ষুন্ন থাকবে, এবং এর কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। প্রতিটি ফের্কার মুসলমান বিশ্বাস করে যে, কেবলমাত্র রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত বন্ধনের মাধ্যমেই চিরন্তন সত্যের আলো লাভ করা সম্ভব। ধর্মীয় বিশ্বাসের বা আকিদার এই মূল বিষয়গুলিতে বিনা ব্যতিক্রমে সকল ফের্কার মুসলমানরাই সমভাবে বিশ্বাসী।

এত কিছুতে এক হওয়া সত্বেও, এমন একটি মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে যা আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে অন্যদের থেকে

আলাদা করে রেখেছে। এই পার্থক্যটি হচ্ছে—ইসলামের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত। এবং এই মূল পার্থক্য থেকেই উদ্ভব ঘটেছে অন্য সব পার্থক্যের।

ইসলামের পুনরভ্যুত্থান হবে কী করে? কী করেই বা এর মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চারিত হবে?

হ্যাঁ, আহ্মদীয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় অন্যান্য মুসলমানরাও স্বীকার করে যে, এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর পুনরাগমন এবং প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর আবির্ভাবের মধ্যে [যিনি হবেন আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ও পরিচালিত সংস্কারক]। বাহ্যতঃ ঐকমত্যের এই বিষয়টি নিয়ে যখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, তখনই সৃষ্টি হয় পরস্পর বিরোধী দুটো বিপরীতমুখী মতের।

আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় হযরত মসীহ্ অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমনের বিষয়টিকে গ্রহণ করে আলংকারিক অর্থে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও রূপকাশ্রিত। আমরা, আহ্মদীয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে শুধু বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে এগুলির প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য গৌরব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে না। অথচ, এর সম্পূর্ণ উল্টো অর্থে অর্থাৎ এগুলির আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার উপরেই জোর দিয়ে থাকে অন্যান্য মুসলিম ফের্কা বা সম্প্রদায়গুলো। এটাই সেই মৌলিক পার্থক্য, যা কিনা আহ্মদীয়া সম্প্রদায়কে অন্যান্য সকল সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পটভূমি

মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান এ যুগের অধঃপতন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দলের বিষয়গুলো সম্পর্কে অনবহিত

ছিলেন না রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ঐশীবাণীর ভিত্তিতে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, মুসলমানরা ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তিনি মুসলমানদের মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশার কথা এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যেন আমাদের এই যুগের দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসসমূহে তাই বিশদ বিবরণ রয়েছে আমাদের এই যামানার। তিনি (সাঃ) বলেছেন—

'ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না। মসজিদগুলি নামাযীতে ভর্তি থাকলেও সেগুলি হেদায়াত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা আসমানের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে।'

অবশ্য এই ভয়ানক বর্ণনার পাশাপাশি তিনি (সাঃ) গৌরবময় শুভ সংবাদও দিয়ে গেছেন। বলেছেন যে, এই চরম দুর্দশা সত্ত্বেও, ইসলামী উম্মাহ্ ধ্বংস হয়ে যাবে না :

كَيْفَ تَهْلَكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ آخِرُهَا

'আমার উম্মত কী করে ধ্বংস হতে পারে, যখন আমি রয়েছি তাদের শুরুতে, এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম শেষে।'—

(মসনদ আহ্মদ : কঞ্জুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন—

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

তোমাদের অবস্থা কী যে (সুন্দর) হবে, যখন ইবনে মরিয়ম নাযিল হবেন তোমাদের মধ্যে, এবং তিনি হবেন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম।"—এবং—

এই একই সংবাদ দিয়েছেন তিনি এভাবেও—

'আমি তাঁরই শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন, অবশ্যই ইবনে মরিয়ম নাযিল হবেন তোমাদের মধ্যে এবং তিনি মীমাংসা করবেন ইনসাফের ভিত্তিতে।'—

—(বুখারী : কিতাবুল আম্বিয়া)।

হযরত নবী করীম (সাঃ) আরও শুভ সংবাদ দিয়েছেন একজন মহান ঈমামের—ইমাম মাহ্‌দীর—যিনি আবির্ভূত হবেন ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে সাথে।

সুতরাং, আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়-গুলির সাথে এই আকিদা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের পুনরুত্থান এবং তার বিশ্ববিজয় 'মসীহ্' এর আগমন ও ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত। অবশ্য এতদ্‌সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে তারা (আহ্‌মদীরা) অন্যান্যদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে। আহ্‌মদীরা এই কথার উপরে জোর দেয় যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে দেখতে হবে—ঐশী বিধানের আলোকে—যে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলীতে,—এবং নবীগণের সেই ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়গুলো এই বিষয়ের উপরে জোর দেয় যে, এসব ভবিষদ্বাণীগুলোর না কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, না কোন গভীর বাণী। এবং তারা এগুলোর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থকেই অনুসরণ করে থাকেন।

অন-আহ্‌মদী মুসলিমদের ধারণা

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ রক্ষা করেই আমি এখন আমাদের বিরুদ্ধ মতামতের আলোচনা করবার চেষ্টা করবো। তাঁরা ইসলামী রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ বলতে বুঝেন ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য। এর এক

প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভবতঃ রয়েছে। ক্ষমতার লালসা এবং সম্পদের লোভ পুরুষানুক্রমে মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। সুতরাং জাতীয় পুনরুত্থানের সর্বোচ্চ সীমা বলতে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকেই বুঝায়। অতএব, তাদের মতে এই সব উদ্দেশ্য হাসিল হলেই বুঝতে হবে যে, ঐশী অনুগ্রহ যথাযথ রূপেই প্রকাশিত হয়েছে। এটাই কমবেশী, ইস-লামের পুনরুত্থান সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা। এই বিশ্বাস অনু-সারে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর আগমনে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের যুগ সূচিত হবে, এবং প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর আবি-র্ভাবে কায়েম হবে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য।

প্রথমতঃ আমি মসীহ্ (আঃ) এর আগমন সম্পর্কিত তাদের ধারণাটার একটা রূপরেখা পেশ করতে চাই। তারা বিশ্বাস করে যে, কুরআনে যে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)কে ইসরাঈলীদের নবী বলা হয়েছে, তিনিই আসমান থেকে নেমে আসবেন সশ-রীরে। নেমেই তিনি তরবারি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন এবং ইসলামের সকল শত্রুকে কতল করে হত্যা করবেন। তাঁর এই বিশ্বজোড়া বিজয় অভিযানের মহান উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম উদ্দেশ্য ঃ ক্রুশ ধ্বংস করা—আলংকারিক অর্থে নয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। খৃষ্ট-ধর্মের এই প্রতীকটির ধ্বংসের কাজ তিনি এমন প্রচণ্ড শক্তির সাথে সম্পন্ন করবেন যে, এর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না। চার্চে, ঘরে, বা গলায় ঝুলানো—একটা ক্রুশও তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, তাদের মতে, শূকর নিধন করা,—তা সে শূকর গৃহপালিতই হোক, আর বন্যই হোক। সুতরাং, তখন 'ক্রুশ'-এর অনুসারীদের কাছে না থাকবে প্রার্থনা করার

জন্যে কোন ক্রুশ, না খাবারের জন্য কোন শূকর হানা। এতে করে, মসীহ্ (আঃ) খৃষ্টানদেরকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবন ধারণের সামগ্রী থেকেই বঞ্চিত করবেন না, বরং তাদেরকে দৈহিক পুষ্টিসাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকেও বঞ্চিত করবেন।

তাদের মতে, মসীহ্ (আঃ) এর তৃতীয় কাজ হবে—দাজ্জালকে বধ করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে — কে এই দাজ্জাল? হাদীসের বর্ণনাগুলিকে যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যেমনটা অনেকেই করে থাকেন, তাহলে — সে হবে এক চক্ষু-কানা ও সুবিশাল দেহধারী। সে আসবে বিরাটকায় এক গাধায় পিঠে চড়ে। সে এত বেশী লম্বা হবে যে, তার মাথা মেঘ ভেদ করে যাবে; এই দাজ্জালের ফিৎনার বিরুদ্ধে সকল নবীই তাঁদের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে গেছেন। এই দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে ধ্বংসকাণ্ড চালাতে থাকবে, তখনই আকাশ থেকে নেমে আসবেন মসীহ্ (আঃ)। তিনি দামেস্কের নিকটে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর, তিনি সারাটা জগৎ জয় করে নিবেন। এবং এই কাজ সমাধা করেই তিনি পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তুলে দেবেন মুসলমানদের হাতে।

সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে, মুসলিম রাজনৈতিক পুনরুত্থান ও আধিপত্য লাভ সম্পর্কিত তাদের দর্শন। এতে মুসলমানদেরকে যে কোন ধরণের রাজনৈতিক সংগ্রাম করা থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেয়া হয়েছে। কাজেই যাঁরা কোন প্রকারের চেষ্টা-চরিত্র ছাড়াই পৃথিবীটার উত্তরাধিকার লাভের নিশ্চিত আশায় বসে বসে আয়েশ করছেন, তাঁরা কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ার পক্ষে অর্থবহ যুক্তি খুঁজে পান না। তাঁরা তাদের অবক্ষয় ও অধঃপতনের সুখময় বিস্মৃতির

অতলেই বাস করছেন। অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও তাঁরা একেবারে নিশ্চিতরূপেই জানেন যে, তাদের সুখের দিন দূরে নয়। কেননা অচিরেই একজন ঐশী-পুরুষ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, এবং সাথে সাথে দিগ্বিজয়ের পথে সামরিক অভিযান শুরু করে দিবেন। তিনি শূকর বধ করবেন। ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল শক্তিকে পদানত করবেন। অতপর, তিনি অপেক্ষমান মুসলিম জনতাকে ইশারায় ডাক দিয়ে বলবেনঃ 'এসো হে আল্লাহ্‌র সৈনিকগণ! এসো ধার্মিকগণ! এসো. এবং গ্রহণ করো পৃথিবীর রাজত্বের এই রাজদণ্ড।' এটাই হচ্ছে, মুসলিম রেনেসাঁর বা পুনর্জাগরণের যুদ্ধংদেহী মতবাদ। এ মতবাদকে আহ্‌মদী মুসলমানরা মনে করে ঘৃণার্হ ও পরিত্যাজ্য। তারা কোনক্রমেই এটাকে এর সাদামাটা শাব্দিক অর্থে সমর্থন করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সম্পর্কিত অন-আহ্‌মদী মুসলমানদের ধারণা। অন্য সব ফের্কার আলেমরা মনে করেন যে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকার তাদের নিজেদের সংগ্রাম বা স্বার্থত্যাগের উপরে নির্ভরশীল নয়, বরং তা নির্ভরশীল ইমাম মাহ্‌দীর অবির্ভাবের উপরে। এবং এই ইমাম মাহ্‌দী হবেন মসীহ্ (আঃ)-এর সমসাময়িক। তাঁর আগমনের পর তাঁর সর্বপ্রধান কাজ হবে দুনিয়ার সব মুসলমানের মধ্যে অফুরন্ত ধন-সম্পদের উপহার বিতরণ করা। তাঁর ঐশ্বর্য হবে সীমাহীন। তাঁর বদান্যতা অবর্ণনীয়। তাঁর সম্পদ এত বিপুল হবে যে, মুসলমানদের ভাণ্ডারসমূহে সেগুলোর স্থান আদৌ সংকুলান হবে না। আর এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাবে সম্পদের লালসা, স্বর্ণের লোভ। অনেকের ধারণা, এটাই হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের অর্থনৈতিক যাবতীয়

ব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র মহৌষধ। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত আছে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সর্বময় প্রতিকার। এজন্যে কোন শরীরের ঘাম বা চোখের পানি ঝরানোর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই শ্রম-সাধনারও। এজন্যে না প্রয়োজন পৃথিবীর কোন খনি-সম্পদ আহরণের, অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপের। না মহা-শূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের, না শিল্প-কারখানার। না উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন, না তার প্রয়োগের। প্রয়োজন যা, তা হচ্ছে — ইমামা মাহ্‌দীর আগমনের, বাস্‌। এ ব্যাপারেও আমরা দ্বিমত পোষণ করি। এবং এটাকে আমরা, আহমদী মুসলমানরা, মনে করি নিছক ছেলেমী বা অর্বাচীনতা, কিংবা স্রেফ বাজে কথা। এ ধারণাটাও তাই প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আহ্‌মদী মুসলমানের মতানুসারে প্রকৃত ব্যাখ্যা —

আহ্‌মদী মুসলিম সম্প্রদায় যদিও মসীহ্‌ (আঃ)-এর অবতরণ এবং মাহ্‌দী (আঃ) এর আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করে না, তবু তারা একটা বিষয়ের উপরে জোর দেয় যে, সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করাটা চরম সরলীকরণ মাত্র এবং তা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমরা, আহমদী মুসলমানরা, বিশ্বাস করি যে, হযরত রসুলে আকরাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর সুউচ্চ মহিমান্বিত মর্যাদা পুরোপুরিভাবে অনু-ধাবন করতে না পারার কারণেই এরূপ মারাত্মক ভুল করা হয়েছে ; ভুল করা হয়েছে তাঁর গম্ভীর ও দার্শনিক বাণীর মর্ম বুঝতে। অনুরূপ কোন গুরুত্ববহ বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষেরা, প্রায় ক্ষেত্রেই, রূপক ও উপমার ব্যবহার করে থাকেন যেগুলির গূঢ় অর্থ ভাসাভাসা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ), দাজ্জাল ও তার গাধা সংক্রান্ত গোটা বিষয়টাই রূপক, আলংকারিক। সুতরাং, এই প্রতিশ্রুত মসীহ্ সেই মসীহ্ নন যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল ইসরাঈলীদের মধ্যে। আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা মসীহ্ (আঃ) ক্রুশের নির্যাতন ভোগের বহু পরে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মসীহ (আঃ), প্রকৃত প্রস্তাবে, অন্য এক ব্যক্তি, যাঁর জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে। ঈসা মসীহ্ (আঃ) এর বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলীর সঙ্গে তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলীর সাদৃশ্যের কারণে, তাঁকেও 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেমন একজন বড় নাট্যকারকে 'সেক্সপিয়ার' বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'ক্রুশ' এর উল্লেখটাও রূপক বা উপমাসূচক। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) আক্ষরিক অর্থে ক্রুশ ভঙ্গ করে বেড়াবেন না। তিনি শক্তিশালী যুক্তিতর্ক ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ দিয়ে ক্রুশ-ভিত্তিক খৃষ্টধর্মকে পরাস্ত করবেন। সুতরাং, 'ক্রুশ' এর ধ্বংসসাধন হচ্ছে আদর্শগতভাবে খৃষ্টধর্মের উচ্ছেদসাধন। একইভাবে, 'শূকর' কথাটাও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এই শব্দটি দিয়ে পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক নষ্টামী ও নোংরামীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে, — যার দরুণ মানুষ পরিণত হয়েছে পশুতে। আমেরিকা ও ইউরোপে যৌন অরাজকতার যে অবাধ লীলা বয়ে চলেছে, তাই প্রকাশ করা হয়েছে 'শূকর' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে। এর দ্বারা সেই অতিশয় জঘন্য লাম্পট্যের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, মাসুম শিশুরা পর্যন্ত যার শিকারে পরিণত হচ্ছে। ঐ হাদীসে নিশ্চয় এ কথা বলা হয়নি যে, মসীহ্ (আঃ) বন্য শূকরের পালগুলোর পিছনে পিছনে ধাওয়া করবেন এবং সেগুলিকে বার বার হত্যা

করবেন। এই অহেতুক ও অস্বাভাবিক কাজের চিত্রটা খোদা-তা'লার একজন নবীর জন্য নিতান্তই একটি উদ্ভট ও বিশ্রী ব্যাপার। এটা বরং গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর 'অ্যাজাক্স' নামক সেই বীরের কথাই মনে করিয়ে দেয়, যে গরু-মহিষ ও মেষপালের সবগুলো পশুকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো, এই উন্মত্ত বিশ্বাসে যে, এগুলি সব গ্রীক সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান সেনা অফিসার। 'ক্রুশ' ও 'শূকর' এবং 'মসীহ্' শব্দগুলির মত 'দজ্জাল' শব্দটিও প্রতীক বা রূপক। দাজ্জাল হচ্ছে সেই বিরাট শক্তিশালী জাতির প্রতীক, যে জাতি কেবল পৃথিবীতেই শাসন চালায় না, মহাশূন্যেও শাসন চালায়। ক্রুশ ও শূকর, বস্তুতঃ এই জাতীরই প্রতীক চিহ্ন। হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে, কিন্তু বাম চক্ষু হবে উজ্জ্বল ও বড়। এটাও রূপক বর্ণনা, যার প্রকৃত অর্থ — এই জাতিটার আধ্যাত্মিক চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টি হবে অত্যধিক প্রখর। এরা আধ্যাত্মিক আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে, তবে এদের দুনিয়াদারী ও পার্থিব অন্তর্দৃষ্টি হবে অতীব প্রখর এবং এ কারণেই এদের পার্থিব উন্নতিও হবে অপরিমেয়।

শেষে আসে দাজ্জালের বিরাটাকায় গাধার কথা। আহমদী মুসলমানরা দাজ্জালের গাধাকেও মনে করে প্রতীকি। এই প্রতীকটির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছিল ভবিষ্যতের যানবাহন ব্যবস্থার কথা। এই গাধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দেয়া আছে, তার সবটাই, বিনা ব্যতিক্রমে, পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত জ্বালানী-চালিত যানবাহনগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। এই গাধার যে বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা আছে, — তাতে আছে যে, এই গাধা আগুন খাবে, যমীনের উপরে চলবে, সাগর পাড়ি দেবে, বাতাসের উপর দিয়ে বিচরণ করবে। এই গাধা এত

দ্রুত গতিতে চলবে যে, কয়েক মাসের রাস্তা কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করবে। লোকেরা তার পিঠের উপরে না চড়ে তার পেটের ভেতরে চড়ে ভ্রমণ করবে, এবং তার পেটের মধ্যে বাতি জ্বলবে। সে তার যাত্রা শুরুর সময় ঘোষণা করবে এবং এর দ্বারা যাত্রীদেরকে তাদের আসন গ্রহণ করতে বলবে। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই বিষয়গুলোর বর্ণনাসমূহ এরূপ বিস্ময়কর ও সঠিকরূপে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে হযরত রসূল পাক মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতাই সমুজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আহ্‌মদী মুসলমানদের ধারণা মতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও রূপক। তিনি যে সম্পদ বিতরণ করবেন মুসলমানদের মধ্যে, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদ, তা পার্থিব নয়। বর্ণিত হয়েছে, এই সম্পদ বেশী করে গ্রহণ করতে কেহ কেহ অস্বীকার করবে। এতেই বুঝা যায়, এটা কি ধরণের সম্পদ হবে। কেননা, মানুষ যতই পায়, আরও চায়। সে তো কখনই পার্থিব সম্পদ লাভে পরিতৃপ্ত হয় না। বরং আরও পেতে চায়। কেবল মাত্র, আধ্যাত্মিক সম্পদকেই মানুষ অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

কাজেই, ইসলামের অন্যান্য ফের্কাগুলো ইসলামী রেনেসাঁর যে দর্শনে বিশ্বাস করে, — যেমনটা আলোচনা করা হলো, — এবং যা তারা প্রচার করে থাকে, আহমদীয়াত তাকে অযৌক্তিক ও বাতিল মনে করে। আহ্‌মদীয়াত মনে করে যে, এই প্রকারের দর্শন শুধু যে কুরআনী শিক্ষার প্রকৃত অভিপ্রায়ের পরিপন্থী তাই নয়, বরং তা নবীগণের ইতিহাসের সাথেও সামঞ্জস্যহীন। সর্বোপরি, এটা হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) এর প্রদর্শিত সুন্নাহ্‌রও ঘোর পরিপন্থী। আহ্‌মদীয়াত ঐ জাতীয় আদর্শিক মাদকতাকে

প্রত্যাখ্যান করে, যা কিনা জাতিসমূহকে অকর্মণ্যতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে পরিচালিত করে — বানোয়াট-বিশ্বাস, দিবা-স্বপ্ন ও কল্পকাহিনীর জগতে।

ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আহ্‌মদীয়া দর্শন

এই দর্শন — প্রতিটি ধর্মের সাধারণ যে উত্তরাধিকার, তা থেকে আলাদা কিছু নয়। এটাই একমাত্র দর্শন যা ইতিহাস সমর্থিত। যদিও ধর্মীয় গ্রন্থাদি এবং পৌরানিক কেচ্ছা-কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (সশরীরে) আকাশে বা স্বর্গে উঠে গেছেন, তথাপি সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আকাশ বা স্বর্গ থেকে কেউ সশরীরে ফিরে এসেছেন — এমন দৃষ্টান্ত বা বিবরণ আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত একজনের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়নি।

বস্তুতঃ, বরাবরই সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে। আর, বরাবরই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ এবং নির্যাতন চালিয়েছে তাঁদের উপরে। তাঁদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্য কখনও কেউ কোন তোরণ-শোভিত অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেনি। তাঁদের কাউকে মাল্য ভূষিত করে বরণ করাও হয়নি। আলোকমালা সজ্জিত কোনও আনন্দোৎসব করা হয়নি কখনও তাদের আগমনে। পক্ষান্তরে, খোদাতা'লার নামে আগমন করার অপরাধে, তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাঁদের পথে কাঁটা ছিঁটানো হয়েছে। তাঁদের মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাঁদের মাথায় কন্টক-মুকুট পরানো হয়েছে। যতভাবে সম্ভব অত্যাচার করা হয়েছে তাঁদের উপরে। আপনারা তাঁদেরকে একবার দেখেছেন — আপাদমস্তক রক্তস্নাত অবস্থায় তায়েফ থেকে ফিরে আসতে; আবারও দেখেছেন ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে

তাঁদেরকে আঘাতে আঘাতে অর্ধমৃত অবস্থায়; দেখেছেন তাঁদের জন্যে প্রাণ বিসর্জনকারীদের লাশের স্তূপের তলে পড়ে থাকা অবস্থায়।

তাঁদের অনুসারীরাও একই ভাগ্য বরণ করেছেন। যত রকমে সম্ভব, নির্যাতন চালানো হয়েছে তাঁদের উপরেও। ভাঙ্গা-চোরা কংকরময় গলি-রাস্তায় তাদেরকে ঠ্যাং ধরে ছেঁচড়ানো হয়েছে। তাঁদেরকে প্রচণ্ড সূর্য তাপে অগ্নিসম বালুরাশির উপরে শোয়ায়ে রাখা হয়েছে। জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়ায়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে চাপ দিয়ে রাখা হয়েছে যতক্ষণ না সেই জ্বলন্ত অঙ্গার নিভে গেছে।

তাঁদেরকে তাঁদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাঁদেরকে অনাহারে রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করা হয়ে। স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে স্ত্রী থেকে এবং স্ত্রীকে স্বামী থেকে। পিতামাতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে সন্তানকে। তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে জীবনধারণের প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকার থেকে। তাঁদের না ইবাদত করতে দেয়া হয়েছে, না মসজিদ নির্মাণ করতে। তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ঘোষণা করার অধিকার থেকেও তাঁদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এমনকি, তাঁদেরকে তাঁদের নিজ ধর্মের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে দেয়া হয়নি।

এভাবেই দান করা হয় মানুষকে নতুন আধ্যাত্মিক যিন্দেগী। এটাই তো সেই পথ, যা পৌঁছে দেয় ধর্মের পুনরুজ্জীবনে। এটাই তো সেই দৃশ্য যা রূপায়িত হতে দেখেছি আমরা হযরত রসূলে করীম মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে। একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তাঁর পরবর্তী নবীগণের জীবনেও। এই হচ্ছে

সেই বিপদসংকুল পথ যা পাড়ি দিয়ে নবী রসূলগণ চিরটাকাল নিজ নিজ জাতিকে পুনর্জীবিত করে গেছেন।

এটাই তো হচ্ছে ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন, যা চলে এসেছে আদম (আঃ) এর যামানা থেকে রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ) এর যামানা পর্যন্ত। প্রকৃত অবস্থা যখন এই-ই, তখন আমরা কী করে মেনে নিতে পারি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর এই অলংঘনীয় ও চিরকালের অনুসৃত নিয়মকে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? একথা কী করে মেনে নিতে পারি যে, মুসলমানরা নিজের রক্তকে পানি না করে চেষ্টা-তদ্বীর ব্যতিরেকেই দুনিয়ার উত্তরাধিকার পেয়ে যাবেন? আমরা কী করে বিশ্বাস করবো যে, আত্মত্যাগের পথ পাড়ি না দিয়েই তাঁরা সাফল্য অর্জন করবেন? এমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি! এবং এখনও ঘটবে না। আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সত্যের কথাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ

"এমন কোন নবী নেই যাঁকে উপহাস করা হয়নি। সুতরাং এটাই হওয়ার ছিল যে, লোকেরা প্রতিশ্রুত মসীহ্কেও উপহাস করবে।

'আল্লহ্তা'লা বলেন ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

'আফসুস আমার বান্দাগণের জন্যে! তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা উপহাস করেনি।" —(৩৬ ঃ৩১)
সুতরাং, আল্লাহ্তা'লার তরফ থেকে এটাও প্রত্যেক সত্য নবীর নিদর্শন যে, তিনি উপহাসিত হয়ে থাকেন। এখন, কেউ যদি

আসমান থেকে সশরীরে অবতরণ করেন, এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন ফেরেশ্তারা এবং তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্যে থাকেন অপেক্ষমান জনতা, তাহলে কি সেক্ষেত্রে তাঁকে কেউ উপহাস করতে পারবে? তাই, জ্ঞানী মানুষেরা এটাই অনুধাবন করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর সশরীরে আসমান থেকে নেমে আসার কথাটা একটা অলীক বিশ্বাস মাত্র। নিশ্চয় মনে রাখুন, কেউই আসমান থেকে সশরীরে নেমে আসবে না। যারা আমার বিরোধিতা করছে এবং এখন জীবিত আছে, তারা সকলেই মারা যাবে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈসা ইবনে মরিয়মকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখবে না; তাদের সন্তানরা এবং তাদের সন্তানদের সন্তানরাও মারা যাবে, কিন্তু তখনও তাদের কেউ ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে আসতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ের মধ্যে এই ভীতি সঞ্চারিত করে দেবেন যে, 'ক্রুশ' এর প্রাধান্যের দিন শেষ হয়ে গেল, অথচ মরিয়মপুত্র মসীহ্— তো স্বর্গ থেকে এখনও নেমে এলেন না! জ্ঞানী ব্যক্তিরা তখন এই বিশ্বাসের প্রতি অধৈর্য হয়ে পড়বেন। এবং আজকের দিন থেকে তিন শতাব্দী অতিক্রম করবে না যখন মুসলমান ও খৃষ্টান উভয়ই দারুন বিরক্ত ও হতাশ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে ধর্ম হবে মাত্র একটি, নেতা হবেন মাত্র একজন (সাঃ)। আমি এসেছি মাত্র বীজ বপন করতে। এই বীজ আমার হাত দ্বারা উপ্ত হয়েছে। এটি এখন অঙ্কুরিত হবে বৃদ্ধি পাবে এবং ফলদান করবে। এর ক্ষতি সাধন করে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।" — (তাজ্‌কেরাতুশ্ শাহাদাতাইন ঃ পৃষ্ঠা ৬৪ — ৬৫)।

এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে যে কোন নিরপেক্ষ চিন্তার মানুষ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আহ্‌মদীয়া দৃষ্টিভংগি ধর্মীয়

ইতিহাসের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, এদের বিরুদ্ধবাদীদের দর্শন হচ্ছে পৌরানিক কাহিনীপ্রসূত এবং তা ধর্মের পুনর্জ্জীবনের ইতিহাস-বিরুদ্ধ। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, খোদাতা'লার নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিরুদ্ধবাদিতার তুফান পাড়ি দিতে হয়েছে। সকল নবীই এসে-ছিলেন সত্যের বাণী নিয়ে, চিরন্তন জীবনের বাণী নিয়ে। তাঁদের বিরোধিতা করেছিল তারাই, যারা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। বস্তুতঃ, এটাই হচ্ছে ধর্মের জন্মলাভ করবার প্রক্রিয়া। যখন অপবিত্রতা এবং ভ্রষ্টতা ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন ইহার পুনরুত্থান বা পুনর্জন্মও ঘটে ঐ একই প্রক্রিয়ায়। খোদা-প্রেরিত সংস্কারকদেরকেও নবীদের মতই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। যখনই সর্বশক্তিমান খোদা কোন জাতিকে আধ্যাত্মিকভাবে পুন-র্জীবিত করতে চেয়েছেন, তখনই তিনি সেই জাতিকে দু'দলে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এক, — যারা সত্যকে সনাক্ত করেছে। দুই, — যারা সত্যের বিরোধিতা করেছে। এদের কোন দল কখনও তাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করেনি। বারবার আবর্তিত এই চক্রকে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় ভাবে ঃ কুরআন পাঠে জানা যায় ঃ

ক) ধর্মের জন্ম এবং পুনরুজ্জীবন হয় ঐশী-নিয়োজিত (নবী ও) সংস্কারকগণের মাধ্যমে। পণ্ডিতদের বা আলেমদের সভা-সমিতি ও আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের সংস্কার সাধন কখনই সম্ভব হয়নি।

খ) বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক ঐশী-নিয়োজিত সংস্কারক জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত আচরণ করা হয়েছে।

গ) এই শ্রেণীর সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়েছে। উৎপীড়ন চালানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের পিতৃপুরুষের ধর্মকে বিকৃত করেছেন। তাঁদেরকে ধর্মচ্যুত ও কাফের আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে ধর্মত্যাগ বা ইরতেদাদের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ঘ) বিরুদ্ধবাদীদের ঘোষিত ধর্মীয় মতানুসারে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার। সংস্কারকগণের সামনে এই শর্ত রাখা হয়েছে যে, হয় তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে ফিরে আসবে, নয়তো তাদেরকে দেশত্যাগ করতে হবে। অন্যথায়, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ঙ) সংস্কারকগণ কখনই আক্রমণ বা সংঘর্ষের পক্ষে কথা বলেন নি। তাদের অনুসারীরাও এমন অটল ধৈর্যের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, তাঁরা তাদের বিশ্বাস বিসর্জন দেয়ার চাইতে দেশ ত্যাগ করা অথবা নিহত হওয়াকেই কবুল করেছেন।

চ) সংস্কারগণ কখনই জনগণকে ক্ষমতা বা উচ্চপদ লাভের আশা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করেন না। তাঁরা বরং, পার্থিব সকল ভোগ-বাসনাকে বর্জন করতে বলেন। তাঁরা জনগণকে সম্পদেরও প্রলোভন দেখান না। বরং, আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন, বিশ্বাস আনয়নকারীদের মধ্যে যাঁরা বিত্তশালী থাকেন, তারা খোদার রাস্তায় তাঁদের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে পরম সৌভাগ্য মনে করেন। যারা ক্ষমতার অধিকারী থাকেন, তারা তাদের ক্ষমতার দর্প ও আড়ম্বর থেকে বেরিয়ে আসেন। আর তখনই, তাঁরা ঐশীজ্ঞানের সমীপে পার্থিব ক্ষমতা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

এটাই হচ্ছে জাতিসমূহের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া, যা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত রসুলে আকরাম মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেককেই এই সকল স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের জাতিকে নবজীবন দান করেছেন দুঃখ-কষ্ট ও আত্মত্যাগের পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে। তাঁরা শিক্ষা দেন প্রেম। তাঁরা অনুসারীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেন কঠোর শ্রমানুরাগ, অবিচল প্রচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত কর্ম্মচাঞ্চল্য। এবং এটাই হচ্ছে সেই বৈপ্লবিক প্রেরণা যা মৃত জাতির দেহে সঞ্চারিত করে প্রাণ। এই চিরাচরিত এবং অপরিবর্তনীয় ঐশী বিধান মানব-প্রকৃতির সহিত এবং মানব-বিবেক ও বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং এটাই সেই বিধান যা গ্রহণ করেছে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়।

ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের এই যে কনসেপ্ট বা ধারণা, তা মানববুদ্ধিসম্ভূত কোন নূতন-উদ্ভাবিত দর্শন নয়। এই ধারণার উৎস হচ্ছে সেই অবিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তনীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা অতি নির্ভুলভাবে এবং নির্জলা সত্যরূপে সংরক্ষিত রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এই ধারণার ভিত্তি হচ্ছে — সেই সকল চিরন্তন নীতি এবং সেই সকল চিরস্থায়ী সত্য, যা প্রতিটি সত্য ধর্মেরই ভিত্তি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কুরআন ঘোষণা করে ঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

'ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। নিশ্চয়, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, সে নিশ্চয় এমন এক হাতলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে যা কখনও ভাঙ্গে না। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।'—(২ঃ২৫৭)।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

'আফ্‌সুস বান্দাগণের জন্যে! তাদের নিকটে এমন কোন রসুল আসেনি, যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।' (৩৬ঃ৩১)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে।'—(১৩ঃ১২)।

যখন হযরত শোয়েব (আঃ) কে ভীতি প্রদর্শন করেছিল তাঁর জাতি এই বলে ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ
مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ

'হে শোয়েব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যারা তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাদের শহর থেকে বের করে দেব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ؔ

আমরা যদি অনিচ্ছুক হই, তবুও ?'—(৭ঃ৮৯)।

হযরত নূহ্ (আঃ) এর জাতিও তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার ভয় দেখিয়েছিল, যদি না তিনি নিবৃত্ত হন ঃ

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝

"তারা বললো, হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তাহলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
(২৬ঃ১১৭)।

এইরূপ আচরণ মাত্র কয়েকজন নবীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নবীদের প্রতি জনগণের এই আচরণকে পবিত্র কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছে এই বলে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۝

'এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা তাদের রসুলগণকে বলেছিল — আমরা তোমাদেরকে নিশ্চয় আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।'

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে শাস্তিদান করা হয়েছিল এই জন্য যে, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন এবং 'সত্য' প্রচার করছিলেন। এই জন্যে পোত্তপতিরা তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে ঘোষণা করেছিল ঃ

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

"তারা বললো — 'তোমরা তাকে আগুনে পুড়ে ফেল এবং নিজেদের উপসাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা সত্যি সত্যিই কিছু করতে চাও।"—(২১ঃ৬৯)।

যীশু খৃষ্টকে ক্রুশে লটকানো হয়েছিল, কারণ তিনি বাইবেলের ব্যাখ্যায় ইহুদী শিক্ষাগুরুদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, যদিও খোলাখুলিভাবেই তিনি স্বীকার করেছিলেন ঃ

"মনে করো না, আমি বিধান এবং নবীদেরকে বাতিল করতে এসেছি। আমি বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি। সত্যিই আমি তোমাদেরকে বলছি, আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যদ্দিন না বিধান পূর্ণরূপে পালিত হয়, ততদিন এর এক কণা বা এক বিন্দুও নষ্ট হবে না।"—(মথি ৫ঃ১৭, ১৮)

আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যীশুখৃষ্ট এবং ইহুদী পণ্ডিতদের মধ্যে যে শ্লোকটির ব্যাখ্যা নিয়ে মূল মত-বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তা হলো ঃ

"এবং এলিজা ঘূর্ণিব্যাত্যায় আকাশে উঠে গেলেন।"

(২ রাজা ঃ ২ঃ১১)।

ইহুদী পণ্ডিতরা এই শ্লোকটির অক্ষরিক ও বাহ্য অর্থের উপরেই জোর দিতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে এলিজা সশরীরে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হবেন। অপর পক্ষে, যীশু দাবী করতেন যে, বিষয়টা রূপক, এর ভাষা প্রতীকি এবং তা আক্ষরিক অর্থবহ নয়। তিনি ঘোষনা করেছিলেন যে, জাকারিয়ার পুত্র যোহন হচ্ছেন সেই এলিজা যাঁর অবতরণ করার কথা ছিল স্বর্গ থেকে। যীশু তো ভালো ভাবেই জানতেন যে, যোহন পৃথিবীর বুকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চয় স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হননি। ইহুদীদের প্রশ্ন—

"কেন তাহলে শিক্ষাগুরুরা বলেন যে, অবশ্যই প্রথম এলিজা আগমন করবেন? — এর জবাবে —

যীশু বলেছিলেন, সত্যিই এলিজা আসবেন এবং তাঁকে সবকিছু পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিজা এসে গেছেন, আর লোকেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর উপরে যা ইচ্ছে তাই করেছে। একইভাবে, মনুষ্য-পুত্রকেও লোকদের হাতে কষ্টভোগ করতে হবে। তখন অনুসারীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহ্ইয়ার কথা বলছেন।" (মথি ১৭:১০—১৩)।

পরিশেষে আমি বলবো যে, হযরত রসূলে করীম মুহাম্মদ (সাঃ) যত দুঃখ-দুর্দশা বরদাস্ত করেছিলেন তা সকল নবীর দুঃখ দুর্দশাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর নিজের কথায় ঃ

'আমি যত অত্যাচারিত হয়েছি, তত আর কোন নবী হননি।'

সুতরাং ধর্মের ইতিহাস আমাদেরকে এই শিক্ষা দান করে যে, নবীরা সকলেই স্বাভাবিক মানুষ, তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর নায়কদের মত আসমান থেকে নাযিল হন না। তাঁরা কঠোর পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনুরাগীরা অপরের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে গৌরব অর্জন করেন না, করেন নিজেদের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে।

—o—

বঙ্গানুবাদ ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনাঃ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশঃ রমজান - ১৪১১
চৈত্র - ১৩৯৭
মার্চ - ১৯৯১

মুদ্রণ ঃ আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪ বকসী বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১
বাংলাদেশ